BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

কাফেরদের শ্রেণীবিভাগ ও তাদের প্রতি আচরণবিধি

-মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

কাফেরদের সাথে আমাদের আচরণ ও সম্পর্ক কিরূপ হবে, তা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট মূলনীতি ও দিকনির্দেশনা। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, কাফেররা সবাই একরকম নয় এবং বন্ধুত্ব বা সম্পর্কও বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তাদের প্রতি আমাদের আচরণও বিভিন্ন রকম হতে পারে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি বা ইসলামের বিরোধিতা করে, তাদেরকে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। তাদের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নে বর্ণিত হলোঃ-

(১) আল্লাহর শত্রুঃ এরা মনে প্রাণে আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করে। এরা আবার দুই রকমের হয়ে থাকে। একদল হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভুল ধারণার কারণে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে; তারা মনে করে, আল্লাহ বুঝি আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আল্লাহ তাআলার হেকমত সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে জেনেশুনেই আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে। এরা আল্লাহর দয়া, ন্যায়বিচার ও পবিত্রতার কথা সবই জানে, কিন্তু তারা নিজেরা যেহেতু নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও পাপের পক্ষে, তাই তারা দয়াময় ও ন্যায়বিচারক আল্লাহকে বরদাশত করতে পারে না। এদের সাথে আমাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের কোন অবকাশ নেই, কেবল তরবারিই ফয়সালা করবে।

(২) কায়েমী স্বার্থবাদীঃ এরা নিজেদের পার্থিব স্বার্থের কারণে মানুষের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। তারা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জানলেও নিজেদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় সত্য দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং কেবল নিজেদের স্বার্থের জন্যই ইসলামের বিরোধিতা করে। দুনিয়াবি স্বার্থের বেলায় কিছু ছাড় দিয়ে এদের সাথে সংঘাত এড়ানোতে কোন দোষ নেই। তবে আল্লাহর নির্দেশ তথা হালাল-হারামের বিধানের ক্ষেত্রে কোন আপোষ করা চলবে না, হারামকে কোন অবস্থাতেই স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। একদল সুবিধাবাদী মানুষ আছে যারা সকল পক্ষের কাছ থেকে নির্বিঘ্ন থেকে নিজেদের স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে চায়। স্বার্থ হাসিলের জন্য ফ্যাসাদে লিপ্ত হবার সুযোগ পেলে তা হাতছাড়া করে না। এদের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, "এখন তুমি আরো এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও নিরাপদ থাকতে চায় এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন থাকতে চায়। যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়; অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি।" (নিসা ঃ৯১) এ ধরনের মানুষেরা মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোন্ পক্ষকে সমর্থন করবে বা কোন্ পক্ষের বিরোধিতা করবে তা নির্ধারণ করে কেবল আপন ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করেই। আল-কুরআনের ভাষায়, "তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়।" (সূরা তওবাঃ৫৮) অন্যত্র বলা হয়েছে, "তারা এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়।" এসব আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থান্বেষী লোকদের সম্পর্কে ফারুক হাসান লিখেছেন, "এরা হল সমাজের সেই সব অবাঞ্ছিত লোক যাদেরকে আমাদের ভাষায় গুণ্ডা বলা হয়। লুটতরাজ, জেনা-ব্যভিচার এদের কাজ। নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাউকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। মুজাহিদদের প্রভাব বেড়ে গেলে রাতারাতি মুজাহিদ সেজে যায়। সরকারের (তৎকালীন আফগান কমুনিষ্ট সরকার) বেতন খেলেও সমাজতন্ত্রের কোন তত্ত্ব এদের মাথায় ঠাঁই পায় না। যেদিকে সুযোগ পায় সেদিকে ঝুঁকে পড়ে।" (আফগান রণাঙ্গন থেকে)

(৩) অজ্ঞমূর্খঃ এরা আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে বিরোধিতার নীতি অবলম্বন করে। এদের কাছে আল্লাহর পরিচয় ও ইসলামের আদর্শ সঠিকভাবে তুলে ধরা মুসলিম উম্মতের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, "তোমার রবের দিকে আহবান কর হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর পছন্দযুক্ত পন্থায়।" (সূরা নাহ্‌ল) আল্লাহ আরো বলেন, "সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।" (সূরা হামীম সেজদাহঃ ৩৪,৩৫) দয়াময় আল্লাহ আমাদের পূর্বাভাস দিয়েছেন, "যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (মুমতাহিনাঃ৭) তবে দাওয়াত পাওয়ার পর যারা তা গ্রহণ করার পরিবর্তে না বুঝে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে, তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। এ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, "নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না।" (সূরা আরাফঃ ১৯৯)

(৪) অন্ধবিশ্বাসীঃ এরা বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে সত্য ধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

(৫) ভীরু-কাপুরুষঃ এরা জান-মাল ও ইজ্জতের ক্ষতির আশঙ্কায় ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না। হত্যা, নির্যাতন, সম্পদহানি বা মানুষের সমালোচনার ভয়ে কিংবা আপনজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার আশঙ্কায় সত্যের পথে পা বাড়াতে পারে না। এদের সাথে মুসলমানরা গায়ে পড়ে কোন সংঘাতে লিপ্ত হতে পারবে না। কেবল আত্মরক্ষার প্রয়োজন হলে তাদের সাথে মোকাবেলা হতে পারে। তারা শান্তিপ্রিয় মানুষ, কারো সাথে কোন সংঘাতে জড়াতে চায় না। সকলের সাথেই বন্ধুত্ব চায়, কারো সাথে শত্রুতা চায় না। এদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে, "কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি।" (নিসাঃ ৯০)

ইসলামের শত্রুদেরকে আরো দুইভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। এক. বিধর্মী সম্প্রদায়ভুক্ত কাফের, দুই. মুসলিম বেশধারী মুনাফিক। সবাই জানি, এর মধ্যে দ্বিতীয় দলটিই সর্বাধিক বিপজ্জনক। কারণ, মুসলমানদের সংস্পর্শে থাকার সুবাদে মুনাফিকরা ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিবহাল থাকে। তাই কোন্ স্থানে আঘাত করতে পারলে মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ করা যাবে, কি উপায় অবলম্বন করলে সর্বোচ্চ সর্বনাশ সাধিত হবে, সে ব্যাপারে তাদের কাছে রয়েছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সেই জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। এর ফলে তারা সহজেই ঝোঁপ বুঝে কোপ মারতে পারে। তদুপরি তারা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে সম্পূর্ণ জেনেশুনে শত্রুতা করে বিধায় তাদের সেই শত্রুতার মাত্রাও সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

কাফেরদের সাথে আমাদের আচরণ কি হবে তা মূলত তাদের আচরণের উপরই নির্ভর করে। এ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, "ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের ব্যাপারেই তোমাদেরকে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম।" (মুমতাহিনাঃ ৮,৯) অর্থাৎ, যারা অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কোনরূপ বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করেনি, বরং সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছে, তারা মুসলমানদের কাছেও সহানুভূতি লাভের অধিকারী হবে। বলাবাহুল্য, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অধিকাংশ মানুষই শান্তিপ্রিয় এবং যেকোন ধরনের অন্যায় ও জুলুমের বিরোধী। তাই যেকোন ধর্মের বা জাতির মানুষই অন্যায় ও অসত্যের কাজে লিপ্ত বা সহযোগী হবার পরিবর্তে এসবের বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে, তাদেরকে মিত্র হিসেবেই গ্রহণ করা হবে। এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা (রাঃ)-এর মাতা হযরত আবুবকরের (রাঃ) স্ত্রী কবীলা হুদায়বিয়া সন্ধির পর মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্য কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু হযরত আসমা (রাঃ) সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার কর।" এরপর আল্লাহ সদ্ব্যবহারের সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। কারণ, কাবিলা নিজে পৌত্তলিকতার অনুসারী হলেও কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে নির্যাতনে অংশ নেননি এবং সন্তানের উপর বাতিল ধর্ম চাপিয়ে দেয়ারও কোন প্রয়াস চালাননি। এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, আমরা কেবল সেই সমস্ত কাফেরের সাথেই শত্রুতা করব যারা ধর্মীয় কারণে আমাদের সাথে শত্রুতা করে। কোন পার্থিব বিষয় নিয়ে বিবাদ হলে তা নিরপেক্ষভাবেই মীমাংসা করতে হবে, সেক্ষেত্রে কে কোন্ ধর্মের অনুসারী সেটা বিবেচ্য বিষয় হবে না। কোথাও কোন মুসলমানের সাথে কোন অমুসলিমের দ্বন্দ্ব হলেই যে সেটা ইসলামী জিহাদ হবে এমন কোন কথা নেই। ইসলামী জিহাদ কেবল তখনই হবে যখন অমুসলিম ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে মুসলিমের উপর আক্রমণ করে, আর মুসলিম ইসলামের প্রতি ভালবাসার কারণে অমুসলিমের সাথে মোকাবেলা করে। অমুসলিমদের মধ্যে যারা এ ধরনের ধর্মীয় বিদ্বেষের পরিচয় দেয়নি, তাদের প্রতি মুসলমানরা সহানুভূতিশীল হবে। যুদ্ধের সময়ও শত্রুবাহিনীর মধ্যে যারা নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপে পড়ে আসে, তাদেরকেও ইচ্ছাকৃতভাবে নিশানা বানানো যাবে না, বরং যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাদেরকে স্বপক্ষ ত্যাগের সুযোগ করে দিতে হবে। যুদ্ধ বিজয়ের পর বিজিত প্রতিপক্ষের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রেও সবার প্রতি সমান আচরণ করা হবে না, বরং যার যার কর্ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে জালেম ছাড়া কারো প্রতি জবরদস্তি নেই।" (সূরা বাকারাঃ১৯৩) অর্থাৎ, আত্মসমর্পণ করলে সাধারণভাবে সবাইকে ক্ষমা করে দিতে হবে, কিন্তু যারা বিশেষ বিশেষ অপরাধে যুদ্ধাপরাধী, যাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য, সেই সমস্ত সীমালঙ্ঘনকারী জালেমদের নিজ নিজ অপরাধ অনুসারে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যেকোন ধরনের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, শান্তিচুক্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদানের সময়ই এ ধরনের অপরাধীদেরকে উক্ত ওয়াদার বাইরে বলে ঘোষণা দিয়ে রাখতে হবে, যাতে যুদ্ধ অবসানের পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক বা আইনগত বাধা না থাকে। অবশ্য সর্বস্তরের অপরাধীদের ক্ষেত্রেও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার নিয়ম ইসলামে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, "আপনি কাফেরদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত হয় তবে অতীতে যা হয়েছে তা ক্ষমা করা হবে; আর যদি তারা পুনর্বার লিপ্ত হয় তবে পূর্ববর্তীদেরই পন্থা নির্ধারিত আছে।" (সূরা আনফালঃ৩৮) যারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা দুনিয়াতেও ক্ষমা পাবে, আখেরাতেও নাজাত লাভ করবে। আর যারা কেবল বাহ্যিকভাবে অনিষ্ট সাধনমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করবে, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা বহাল রাখবে, তারা মানুষের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে, তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। সাধারণ ক্ষমা লাভের পরেও যদি কারো মধ্যে কোনপ্রকার নাশকতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন আর দ্বিতীয়বার ক্ষমা করা যাবে না, কারণ বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা করার বিধান ইসলামে নেই। অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া বিতর্ক করবে না, তাদের মধ্যে যারা জালেম তাদের ছাড়া।" (সূরা আনকাবূত) অতএব, সাধারণ অমুসলিমদের ক্ষেত্রে সদাচরণের দ্বারাই বোঝাতে হবে, আর কঠোর ব্যবহার কেবল জালেমদের প্রতিই প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে নবী, জিহাদ করুন কাফের ও মুনাফিকদের সাথে; আর তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।" (সূরা তওবাঃ৭৩) কুরতুবী ও মাযহারীতে বলা হয়েছে, "প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হল মৌখিক জিহাদ। অর্থাৎ, তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে।" তাফসীরে কাবীরের ভাষ্যমতে, "কাফেরদের সাথে জিহাদ হবে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে, আর মুনাফিকদের সাথে হবে কখনো দলীল-প্রমাণ উপস্থিত করার মাধ্যমে, আবার কখনো নম্রতা পরিহারের মাধ্যমে, আবার কখনো কথা-বার্তায় কঠোরতার মাধ্যমে।" আর আমার মতে, প্রকাশ্য কাফের অথবা মুসলিমবেশী মুনাফিক যে কেউ যদি অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ করে, তার মোকাবেলা অস্ত্রের দ্বারাই করতে

হবে। আর যদি রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করে, তাহলে তার মোকাবেলা রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। তবে কেউ যদি কোন ধরনের সূক্ষ্ম কারসাজির মাধ্যমেও আমাদের দ্বীন বিপন্ন করার প্রয়াস চালায় কিংবা আমাদের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়, তাহলে সে এক্ষেত্রে কোন রক্তপাতের আশ্রয় না নিলেও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।

কাফের-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষের অধঃপতনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তা এবার একটু আলোচনা করা যাক।

১ম স্তর- ফাসেকঃ মানুষ যখন কেবল নিজে পাপ করে, তখন সে হয় ফাসেক।

২য় স্তর- জালেমঃ মানুষ যখন নিজের পাপের স্বার্থে মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার করে, তখন সে হয় জালেম।

৩য় স্তর- কাফেরঃ মানুষ যখন নিজের পাপ ও জুলুমের স্বার্থে আল্লাহর সাথে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে হয় কাফের।

৪র্থ স্তর- খান্নাস/ইবলীস/শয়তানঃ কোন জিন বা মানুষ যখন কেবল নিজে কাফের ও পাপী হয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদেরকেও কুফর ও অসৎকর্মের প্ররোচনা দেয়, তখন তাকে খান্নাস, ইবলীস বা শয়তান বলে অভিহিত করা যায়।

৫ম স্তর- তাগূতঃ যারা কেবল কুমন্ত্রণা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং মানুষকে বিপথগামী করতে বলপ্রয়োগ করে, তাদেরকে বলা হয় তাগূত। এরা সরাসরিও মানুষকে ঈমান পরিত্যাগ করার জন্য চাপ দিতে পারে, অথবা কৌশলে ঈমান পরিপন্থী কাজে লিপ্ত করার মাধ্যমে ঈমান নষ্ট করার প্রয়াস চালাতে পারে। যারা কেবল মৌখিকভাবে ধর্মত্যাগের ঘোষণা আদায়ের জন্য নির্যাতন করে, তাদের কাছে তো মৌখিকভাবে দাবি মেনে নেয়ার কথা বলেও অন্তরে ঈমান বজায় রাখা যায়। কিন্তু যারা হারাম কাজ ও হারাম খাদ্য চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মানুষের দেহটাই অপবিত্র করে দেয়, মানুষের সত্ত্বাকেই ঈমান ও ইসলামের অনুপযোগী করে দেয়, তাদের হাত থেকে ঈমান রক্ষা বড়ই কঠিন। যারা কেবল দৈহিক নির্যাতন করে, তাদের হাতে নির্যাতন সহ্য করে জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও ঈমান ও চরিত্র ঠিক রাখা যায়। কিন্তু যারা ঈমানের উৎসমূলেই সরাসরি আঘাত করে, তাদের হাত থেকে মরে বাঁচারও সুযোগ নেই। যাহোক, এ উভয় শ্রেণীর তাগূতের সাথে কি আচরণ করতে হবে, সে সম্পর্কে কুরআনের বিধান হচ্ছে, "যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস চালায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের বিপরীত দিকের হাত ও পা কেটে দিতে হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।" (সূরা মায়েদা)

কুফর শব্দের অর্থ অস্বীকার, অবিশ্বাস, অবাধ্যতা, প্রত্যাখ্যান, বিদ্রোহ, শত্রুতা ইত্যাদি। কুফরী যতক্ষণ কেবল অবিশ্বাস ও অবাধ্যতায় সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তা সহ্য করা যায়, সংশোধনের প্রয়াস চালানো যায়। কিন্তু যখন তা বিদ্রোহ ও শত্রুতার পর্যায়ে চলে যায়, তখন আর সেই পর্যায় থেকে ফিরিয়ে আনার কোন অবকাশ থাকে না। কাফেরদেরকে আমরা আরো দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যথা-- Non-Muslim এবং Anti Muslim। এই Anti Muslim আবার দুই ধরনের হতে পারে। কেউ আছে নিছক ধর্মীয় ও জাতিগত কারণে ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরিতা পোষণ করে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে। আর একদল আছে স্বয়ং স্রষ্টার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আল্লাহর সাথে শত্রুতার কারণেই আল্লাহর বান্দাদের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টায় মেতে থাকে। এই শেষোক্ত দলটির সাথেই আমাদের জীবন-মরণ শত্রুতা, এদের সাথেই হবে আমাদের দা-কুমড়ার সম্পর্ক।

যাহোক, আমরা জানতে পারলাম যে, কাফেরদের মধ্যে নানা ধরনের মানুষ রয়েছে এবং তাদের একেক শ্রেণীর প্রতি আমাদের আচরণও একেক রকমই হবে। তবে একটি আচরণ কারো সাথেই করা যাবে না, তাহল অশ্লীল গালিগালাজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন কেবল উত্তম কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরা বনী ইসরাইলঃ৪৩) অতএব, শয়তানী কথাবার্তা নিজেদের বিরুদ্ধে তো দূরের কথা, শয়তানের কথার জবাবে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধেও উচ্চারণ করা যাবে না। কারণ, শয়তানের অশ্লীলতার জবাবে যদি আমরাও অশ্লীলতার আশ্রয় নেই, তাতে সেই সন্তুষ্ট হবে। নিজে কলঙ্কিত হয়েও যদি আমাদের মুখ নষ্ট করতে পারে, ঈমান ও চরিত্র ধ্বংস করতে পারে, তবুও সে খুশী। শয়তান নিজেও মানুষের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, আবার মানুষের পরস্পরের মধ্যেও সংঘর্ষ লাগিয়ে দেয়। মানুষের পারস্পরিক সংঘর্ষ বলতে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের সংঘর্ষও হতে পারে, আবার মুসলমানদের অন্তর্দ্বন্দ্বও হতে পারে। অর্থাৎ, শয়তান আমাদেরকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ব্যস্ত রাখতে চায়, যাতে আমরা শান্তিতে আল্লাহর এবাদত করতে না পারি। তাই যতদূর সম্ভব কলহ-বিবাদ এড়িয়ে চলাটাই ইসলামের নীতি। মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংযম ও সহনশীলতার পরিচয় পরিচয় দিতে হবে। আর কাফেরদের মধ্যে যারা খোদাদ্রোহিতা ও বর্বরতার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়নি, শয়তানের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়নি, তাদের সাথেও সংঘাত যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। তবে যারা শয়তানী ও তাগূতীপনার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গিয়েছে, তাদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে বরদাশত করা চলবে না। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত অপপ্রচার হয় তার জবাব দেয়া, ইসলামের শত্রুদের স্বভাব-চরিত্র ও কার্যকলাপ ফুটিয়ে তোলা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু তা হতে হবে স্বাভাবিক ভাষায়, কোন ধরনের অশ্লীল শব্দ মুখে আনা যাবে না। কারণ, অশ্লীলতা জিনিসটাই ইসলামে হারাম। হারামের বদলে হারামের দ্বারা প্রতিশোধ নেয়া যায় না। উদাহরণসরূপ, কেউ তোমাকে জোর করে মদ খাইয়ে দিলে তুমি তাকে পাল্টা মদ খাইয়ে দিতে পার না। কুকুর কামড় দিলে কুকুরকে দাত দিয়ে কামড় দেয়া যাবে না, তবে অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা যেতে পারে। বলপ্রয়োগের মোকাবেলায় বলপ্রয়োগ না করে পারা যায় না, কিন্তু গালিগালাজের জবাবে গালিগালাজ না করেও পারা যায়। তাই ইসলামে সশস্ত্র লড়াইকে অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু অশ্লীল গালিগালাজকে অনুমোদন করা হয়নি। এছাড়া আরো একটি কাজ আছে যা কোন কাফেরের বিরুদ্ধেও করা যাবে না, তাহল মিথ্যা অভিযোগ করা। কারণ, এটি নীতিগতভাবে একটি অন্যায় কাজ, তদুপরি এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায় না, বরং নিজেদেরকেই ঘায়েল হতে হয়। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অবান্তর অভিযোগ করলে যখন তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে, তখন সত্য অভিযোগগুলোরও কোন বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না, ফলে প্রতিপক্ষ বাস্তবে যেসব অপরাধে অপরাধী, সেসব অপরাধ থেকেও নির্দোষ বলে বিবেচিত হবে। অতএব, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা ধারণাও করা যাবে না, বরং যাচাই-বাছাই করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, "আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" (সূরা আম্বিয়া) অতএব, মিথ্যাকে ধ্বংস করার কাজ কেবল সত্যের দ্বারাই সম্ভব, মিথ্যার দ্বারা নয়।